নাট্যকার : যাঁর হাতে ক্ষুরধার তলোয়ার

উৎপল ঝা

'একজন প্রথম শ্রেণির কবি যদি কথা বলতে ভালোবাসে তাহলে যা দাঁড়ায়, মোহিত ছিল তারই চলন্ত-জীবনরূপ', নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়-এর প্রয়াণে তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু, অভিনেতা, নির্দেশক শ্যামল ঘোষ এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন যে, 'কবি থেকে নাট্যকার হয়েছিল বলে ওর সেই পর্বের নাটকগুলোর সংলাপ যেমন কবিতাধর্মী ছিল, তেমনই ক্ষুরধার বুদ্ধির শরীরে বাঁধা।'

নাট্য আকাদেমির সূচনাপর্বে -১৯৯০ সালে আমি নাট্য আকাদেমির প্রশাসনিক আধিকারিক -এর দায়িত্বে যোগ দিই —মুর্শিদাবাদ-এর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকারিক -এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে। গাঁয়ের ছেলে আমি — মুর্শিদাবাদে এসে নাটকের বলা ভালো থিয়েটারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। বিশেষত মুর্শিদাবাদ জেলায় তখন ছান্দিক, প্রান্তিক, বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার, যুগাগ্নি এবং ঋত্বিক -এর মতো নাট্যসংস্থা কলকাতার সঙ্গে সমানে সমানে এগিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময় আমার সুযোগ হল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির পক্ষে একটি প্রশিক্ষণ শিবির বহরমপুরে আয়োজন করার। বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত এই নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির চলছিল ৩১ জুলাই - ৬আগস্ট, ১৯৮৮ পর্যন্ত। নদীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলার ৩১ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। প্রশিক্ষক হিসেবে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা বাংলার নাট্যজগতের নক্ষত্রবিশেষ খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন, বিভাস চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অসিত মুখোপাধ্যায়, দেবেশ চক্রবর্তী, দেবাশিস দাসগুপ্ত এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়। শিবির পরিচালক ছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়।

সেই প্রথম মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে কাছ থেকে দেখবার এবং জানবার সুযোগ

ঘটে। এ প্রসঙ্গে একথা বলা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই শিবিরে শিক্ষার্থী হিসেবে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বর্তমানে নাট্যজগতে তাঁদের জায়গা স্থায়ী করে নিয়েছেন যেমন কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, পরিমল ত্রিবেদী, বিধান টুডু, সন্দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সাদা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ বেশ ফিটফাট, ঘন ঘন সিগারেট চলনে-বলনে আয়েসি, পরিচ্ছন্ন ও আভিজাত্যমণ্ডিত মানুষটিকে একটু দূর থেকেই দেখেছিলাম। একথা জানা ছিলনা তখন, যে তিনি একদা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর কলেজেই অধ্যাপনা করেছেন।

কলকাতার নাট্য আকাদেমিতে যোগ দেওয়ার পর অবশ্য বিভিন্ন সভা-সমিতিতে মোহিতদার সঙ্গে নিয়মিত দেখা হত। তখন তিনি বারুইপুর-এর দিকে থাকতেন, ফলে যেদিন কলকাতায় আসতেন কিছুটা সময় নাট্য আকাদেমিতে কাটিয়ে যেতেন। তখন নাট্য আকাদেমির অফিস ছিল তথ্যকেন্দ্রের নিচের তলার একটা বড় ঘরে। সেখানে অনেকদিন অনেকবিষয় নিয়ে আড্ডা দিয়েছেন, তাঁর বাচনভঙ্গিও ছিল খুব সুন্দর। দুঃখের বিষয় সেসব আলোচনা ধরে রাখা হয়নি।

১৯৮৯ সালে ২৪ অক্টোবর গিরিশমঞ্চে তার 'সোক্রাতেস' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটি নাট্য-আকাদেমি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করি। সেখানে নাট্যকারের পরিচিতি হিসেবে লেখা হয়েছিল — 'আষাঢ়ে-শ্রাবণে', 'গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-র আধুনিক কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকার রূপে প্রথম আর্বিভাব ১৯৬৩-তে 'গান্ধর্ব' পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকের মাধ্যমে। তারপর নক্ষত্র গোষ্ঠীর শ্যামল ঘোষের প্রয়োগ প্রযত্নে সাড়া জাগানো প্রযোজনা 'মৃত্যু-সংবাদ' -এর মধ্য দিয়ে ১৯৬৫ থেকে তাঁর সেই যে কাব্যময় নাট্যভাষার অভিযান বাংলার লিট্‌ল থিয়েটারের জগতে প্রবর্তিত হয় সেই কাব্যময় নাট্যভাষার মধ্যেই সমকালীন জীবন-দ্বন্দের সংগ্রামের স্বরূপ উপলব্ধিই মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে আজ বাংলা থিয়েটারের বিশিষ্টতম নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।'

১৯৯১ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর সামগ্রিক নাট্যসৃষ্টির জন্য ভারতসরকারের সংগীত-নাটক-আকাদেমির 'আকাদেমি পুরস্কারে' ভূষিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

'সোক্রাতেস' নাটকের সংলাপের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই সেই কাব্যময় নাট্যভাষা —অথচ সে ভাষা মোটেই এলানো নয়। সোক্রাতেস বা সক্রেটিস -এর চরিত্রের যে দৃঢ়তা, তাঁর যুক্তিবাদী মন তা অদ্ভুত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে :

প্রাইতেনিস বিচার সভায় সোক্রাতেস যখন সভাপতির আসনে বসে নিরপেক্ষ বিচারের জন্য চেষ্টা করছেন তখন অন্যান্য বিচারকরা সোক্রাতেসকে ভয় দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করে :

আর্কিদেমস : সোক্রাতেস, যদি নিজের মঙ্গল চান, তাহলে এখনো প্রস্তাব ভোটে তুলুন।

সোক্রাতেস : আমি তোমাদের সকলের মঙ্গল চাই।

বিচারক ৩ : এসব গালভরা বুলি শুনিয়ে কোন লাভ হবে না। আপনি কেবল একদিনের জন্য সভাপতি। কালই যখন সভা বসবে তখন অন্য সভাপতি নির্বাচন হবে এবং প্রস্তাবও গৃহীত হবে।

আর্কিদেমস : একদিনের জন্য গোয়ার্তুমি করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

সোক্রাতেস : একদিন আমার কাছে চিরদিনের মতো বিস্তৃত, এক মুহূর্ত আমার কাছে অনন্ত কালের মতো মূল্যবান।

বিচারক ৩ : কিন্তু এতগুলো সদস্য যা চাইছে, দেশশুদ্ধ লোক যা চাইছে তার কোনও মূল্য আপনি দেবেন না?

সোক্রাতেস : এতগুলো লোক কি চাইছে সেটাই আমি আগে ভাবি। তারা বিষফল খেতে চাইলে আমি তা দেবনা। তোমাদের গণতন্ত্র কেবল মানুষ গণনা করছে, মানুষের ভাগ্য গণনা করছে না।

বিচারক ১ : এই সোক্রাতেস, একশ্যে গণতন্ত্রের অপমান করে, বিদ্রূপ করে। এই সভাতে প্রস্তাব ভোটে না তোলার পেছনে গণতন্ত্রের বিরোধিতাই আসল কথা। গণতন্ত্রের শত্রুকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার — মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

সোক্রাতেস : দরকার হলে মানুষের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়বই। তবে আমি জানি, কোন মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। আমরাও গণরাজ্যের কথা বলি কিন্তু সে গণরাজ্যের নাগরিকদের ভালোমন্দের ধারণাটি থাকবে পরিষ্কার। নইলে সংখ্যার জোরে গণতন্ত্রের নাম নিয়ে কারা যে আমাদের ঘাড়ে চেপে টুঁটি টিপে ধরবে কে জানে। গণতন্ত্রের পতাকাটাই কেবল দেন না। তার আড়ালে স্বৈরাচারীও ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সোক্রাতেস এর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর জ্যান্থিপ্পীর যে সম্পর্ক নানা জনে নানাভাবে চিত্রিত করেছেন কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায় সেই জ্যান্থিপ্পীকে যেভাবে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে চিত্রিত করেন তা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য, যেমন বিচার পতি আর্থোনের সোক্রাতেসের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের অভিযোগ উত্থাপন করে — যখন বিচারালয়ে উপস্থিত

থাকার নির্দেশ পাঠান তখন সোক্রাতেসের স্ত্রী জ্যান্থিপ্পী বলে ওঠেন — "সোক্রাতেস, এ আথেন্সে আর নয়। আমার এই অকৃজ্ঞ আথেন্স ছেড়ে চলে যাব। অনেক, অনেক ভালোবেসেছ তুমি আথেন্সকে — এবার তুমি ঘেন্না করো। হ্যাঁ, ঘেন্না করে আথেন্স ছেড়ে যাও! যে আথেন্সের সুখের জন্য তোমার ঘুম নেই, যে আথেন্সের মঙ্গল চেয়ে তোমার এই ভিক্ষুকের জীবন, ঘোর অকৃতজ্ঞ না হলে সেই আথেন্স কোন মুখে তোমার মৃত্যুদন্ড চায়। কোন অধিকারে? (কেমন শক্ত হয়ে ওঠে) গোটা আথেন্সে তোমার মৃত্যুদন্ড চাইতে পারে এক জন। মাত্র এক জন। আমি। জ্যান্থিপ্পী। তোমার স্ত্রী। তোমার মত উদাসীন, নির্বিকার স্বামী সংসারে অভিশাপ। মানুষ জন্মালে তার খিদে পায়, জন্তুর মত বেঁচে না থেকে মানুষ হতে চায়। সে কথা ভাবার সময় তোমার নেই অথচ তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়েছ তুমি। তারপর উপেক্ষা, উপেক্ষা আর উপেক্ষা। তোমার মৃত্যুদন্ড হলে কি এসে যায় আমার? তিনটি সন্তানের কি খোয়া যায়? কতটুকু ক্ষতি হয়? (কান্নায় ক্রমশ ভাঙতে থাকে) এত জ্বালা আমার ,কিন্তু সংসারের বোঝা, নির্বিকার, অবুঝ এই বৃদ্ধ মানুষটা আর নেই একথা ভাবতে পারিনা। এই খালি পায়ের, ছেঁড়া পোশাকের ভিখিরি মানুষটাকে আর দেখব না, ভাবলে সব অন্ধকার হয়ে আসে। ওকে তোমরা বাঁচতে বলো, ক্রিতো — প্লাতো — ক্রিতোগৌলাস ওকে আথেন্স ছেড়ে চলে যেত বলো — তোমারা বলো — কিছু বলো ...।"

তাঁর সংলাপে অদ্ভুত পরিমিতিবোধ। সোক্রাতেসের জীবনের সারাৎসার তাঁর বিশ্বসের কথা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নাট্যকার যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা স্মরণযোগ্য : সোক্রাতেস : বন্ধুগণ, আমার বিরুদ্ধে এরা যে অভিযোগ এনেছে তা ভিত্তিহীন বলেই আমি মনে করি। কিন্তু আগেই বলেছি , বহুকালস্থায়ী যে বিদ্বেষ তা দু-চার কথায় নির্মূল করা কঠিন। তবে জীবনের শেষে এত মানুষের সামনে মনের কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ। অজ্ঞতা, মিথ্যা এবং ভ্রান্তি যেখানে, সেখানেই কেবল আমি বিরুদ্ধতা করতে চেয়েছি। তোমাদের গণতন্ত্র যদি মানুষকে নিয়ে হয় আমি সবার আগে সেই মানুষকে গড়ার কথা বলেছি। ঈশ্বর আমাকে দংশরূপে পাঠিয়েছেন তাই তোমাদের দংশন করেছি জাগাবার জন্য। আমি তোমাদের পিতার মতো, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তোমাদের চৈতন্য জাগাতে চেয়েছি — যাতে তোমরা সচেতন, যুক্তিশীল খাঁটি মানুষ হও। দেখ আমার জীবন, আমার সংসার,আমার এই মলিন বেশবাস — বিনিময়ে আমি কিছুই চাইনি। মৃত্যুর ভয় আমার নেই। পটিডিয়া, ডিলিয়ম এবং অ্যাসফিপলিসের যুদ্ধে আমি তিন বার দেশের স্বার্থে যোগ দিয়েছিলাম। মৃত্যু ভয়ে পিছিয়ে যাইনি। লিওনকে হত্যা করার ব্যাপারেও ক্রিতিয়াসের হুকুম আমি অগ্রাহ্য করেছি অনিবার্য মৃত্যু জেনেও। আজও মৃত্যুর মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়েছি — আজও কোন ভয় নেই আমার।

বিচারালয় থেকে শৃঙ্খলিত সোক্রাতেসকে যখন কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন সোক্রাতেস বলে ওঠে — *'এখন সময় হয়েছে, এখান থেকে বিদায় নিতেই হবে। আমি যাব যেদিকে মৃত্যু, তোমরা যাবে যেদিকে জীবন। আমাদের মধ্যে কে সঠিক পথে গেল তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন'।*

নাটকের শেষ অংশে কোরাস যে গান — এর মাধ্যে যবনিকা নেমে আসে সেখানে কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায—এর কার্যকরী নাট্যভাষা আরও মূর্ত হয়ে ওঠে —

কোরাস : (গান) খাঁটি সোনায় মানুষ যদি গড়তে চাই
দৃষ্টি মেলে সৃষ্টি যদি দেখতে চাই
সোক্রাতেসের মৃত্যু নাই, মৃত্যু নাই।

যুক্তি দিয়ে মুক্তি যদি আনতে চাই
প্রশ্ন করে সত্য কি তা জানতে চাই
সোক্রাতেসের মৃত্যু নাই, মৃত্যু নাই।

থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'রাজরক্ত' নাটক প্রকৃতপক্ষে মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। প্রসঙ্গত একথাও বলার যে বিভাস চক্রবর্তীরও প্রথম স্বাধীন নির্দেশনাও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত'।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্যকৃতির তিন দশক উপলক্ষে ৬টি নাট্যসংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ১জুন, ১৯৯৪ তারিখে একাডেমির মঞ্চে মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিল আমারও। শুধু সংবর্ধনা নয়, পরপর কয়েক দিন ধরে মঞ্চস্থ হয়েছিল মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত বা নাট্যরূপকৃত সুন্দর (সংস্তব) জোছনাকুমারী (অন্যথিয়েটার) মুষ্টিযোগ (সংস্তব) তোতারাম (সমীক্ষণ) শমীবৃক্ষ (প্লে মেকার্স), তখন বিকেল (গান্ধার) নোনা জল (সমকালীন শিল্পীদল)। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, মনোজ মিত্র, কু মার রায়, বিভাস চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, সনৎকুমা র চট্টোপাধ্যায়, তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস প্রমুখ।

মাত্র দুটি চরিত্র নির্ভর নাটক 'তখন বিকেল'. বাংলা নাট্য জগতে প্রবল প্রভাব ফেলেছিল। অশোক মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত অভিনীত এই নাটক প্রথমে 'গান্ধার' পরে চুপকথা নাট্যসংস্থার ব্যানারে যেমন অভিনীত হয়েছে তেমনি এই নাটকের একমাত্র নারী চরিত্রে শিপ্রা লাহিড়ী , দীপা দাসমুন্সী এবং ডলি বসুর অভিনয়ও স্মরণীয়। যেমন সংলাপ তেমনি অভিনয় ও নির্দেশনা। কতবার কত জায়গায় যে এই নাটক দেখেছি তার সংখ্যা বলা

মুসকিল এবং এই নাটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে এতবার দেখেও কখনও পুরনো মনে হয়নি, আকর্ষণ কমেনি। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক গুলির মধ্যে 'তখন বিকেল' যেমন অন্যতম তেমনি অশোকমুখোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়ও দেখেছি 'তখন বিকেল' এ অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে মহাকালীর বাচ্চা, মৃচ্ছকটিক, কানামাছি খেলা, গুহাচিত্র, ক্যাপটেন হুররা, মৃত্যু সংবাদ, জন্মদিন (নাট্যরূপান্তর) গ্যালিলিওর জীবন, বাজপাখি, লাঠি, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি।

নাট্যকার হিসাবে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটককে সাহিত্যের ঘেরাটোপ থেকে বিযুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন চলচ্চিত্রের মতো নাটকও একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম তাঁকে সাহিত্যের শাখা হিসেবে বিবেচনা করার কোন যুক্তি নেই। তাঁর এই অভিমত নিয়ে সাহিত্য সমালোচকরা একমত ছিলেন না বরং অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করতেন। কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এই মতের পোষণ ও প্রচার কারে গিয়েছেন।

কবি ও নাট্যকার শুধু এই পরিচয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে বাধা সম্ভব নয়। গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার হিসেবেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু তাই নয় 'সুবর্ণলতা', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'আরোগ্য নিকেতন', প্রভৃতি সকল ধারাবাহিকের চিত্রনাট্যকারও মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও 'মেঘের খেলা' নামে একটি চলচিত্রের নির্মাতা তিনি, যা রাষ্ট্রপতির পুরস্কারও অর্জন করেছে।

নাট্যকার হিসাবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের যে বৈশিষ্ট চোখে পড়ে তা হল তাঁর নিজেস্ব কোনও নাট্যদল নেই। তিনি নাট্য নির্দেশনা বা অভিনয়ে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেননি। তাই সকল নাট্যদলের সঙ্গেই ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক এবং বহু নির্দেশকই তাঁর ভাবনা ও স্বপ্নকে মঞ্চে রূপদান করার সুযোগ পেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে ১ থেকে ৭ ডিসেম্বর সাগরদ্বীপে নাট্যরচনা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের পরিচালক ছিলেন মনোজ মিত্র অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু বসু, চন্দন সেন, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, এবং মামনুর রসিদ (বাংলাদেশ)। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে আমরা মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে পাইনি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই শিবির থেকে উঠে আসা নাটকগুলি থেকে নির্বাচিত কয়েকটি নাটককে নিয়ে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় তাতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে নাট্যরচনা বিষয়ে তাঁর মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

১৯৩৪ সালের ১জুন অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ফকিরবাড়িতে তাঁর জন্ম। লেখাপড়া সেখানকার ব্রজমোহন স্কুলে, পরবর্তীকালে কলকাতার সিটি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হিসেবে সপরিবারে প্রথমে পাতিপুকুর পরে বারুইপুরে থিতু হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য ২০০১ সালে দক্ষিণ কলকাতার রানীকুঠি সরকারি আবাসনে উঠে আসতে বাধ্য হন। জ্ঞানেশ মুখ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি নাট্য আকাডেমির সভাপতি মনোনিত হন। ১২ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে ৭৮ বৎসর বয়সে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' ধারনকারী নাট্যকারের জীবনাবাসন ঘটে। দীর্ঘ পাঁচদশকের নাট্য জীবনে বাংলা রঙ্গমঞ্চকেতিনি তাঁর বৈচিত্রপূর্ণ নাট্যসম্ভারে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সর্বশেষ নাটক 'তথাগত' কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, যা তাঁর নাট্যজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হওয়ার দাবি রাখে। রাজনীতি সচেতন এই নাট্যকার মানুষের 'মন'-এর গভীরে যেভাবে বিশ্লেষণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

তাঁর প্রয়াণে নাট্যজগতে গভীর শোকের বাতাবাহ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে —'সন্দেহ নেই, নাট্যজগতে একটি আবস্মরনীয় নাম মোহিত চট্টোপাধ্যায়'। তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু শ্যামল ঘোষকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি — 'যাঁরা মোহিতকে শুধু 'কিমিতিবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করবেন তাঁরা ভুল করবেন জীবন থেকে রাজনীতি, সর্বত্র সে নাট্যকার হিসেবে দীপ্ত ব্যক্তিত্ব খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।'